ATMADEEP
An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, April, 2026, Page No. 251-257
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.456

বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে নারীর বিচিত্ররূপ: একটি বিশেষ রূপরেখা

ড. কল্পনা মজুমদার, *সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, আরকেডিএফ বিশ্ববিদ্যালয়, রাঁচি, ভারত*

Received: 04.04.2026; Accepted: 09.04.2026; Available online: 10.04.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

Although woman is known as the better half of man, throughout the ages she has been insulted, humiliated, and kept veiled in various ways. The inner world of such a woman has rarely been brought to light by others. Bankimchandra, however, with deep fascination, has beautifully portrayed the diverse forms of women and their psychological conflicts. At times, he has depicted women as lovers, at times as daring figures, and sometimes as sorrowful beings. He has rendered women extraordinarily beautiful through their grace and charm.

Keywords: Diverse forms of women., women's love and romance, desire, sexual life, Suryamukhi, Kundanandini, Rohini, Bishabriksha

প্রকৃতি ও নারীকে কবিরা সর্বদা এক সূত্রে গেঁথেছেন। মনের পৃথিবীর যা কিছু সৃষ্টিশীল শিল্পকর্ম তার অর্ধেক পড়েছেন নারী। নারীর বৈচিত্রে ও ব্যাপ্তি এক মহিমাময়ী রূপে চিরকাল বিরাজমান। রবীন্দ্রনাথ তার কাব্যে কখনও নারী প্রথাগত সামাজিক শৃংখল ভেঙ্গে নারীকে তার স্বাধিকার অর্জনের অধিকার দাবি করার কথা বলেছেন। নারী কখনো প্রেয়সী, কন্যা-জননী কখনো বা পত্নী রূপে চিরকাল পুরুষের দিয়েছে। নারীর বৈচিত্রপূর্ণ অধিকারের দাবি আমরা রবীন্দ্রনাথের 'মহুয়া' কাব্যের 'সবলা' কবিতাটিতে পাই।

"নারীকে আপন ভাগ্য জয় করিবার
কেহ নাহি দিবে অধিকার
হে বিধাতা।"[১]

কাজী নজরুল ইসলাম তার সাম্যের গানেও নারীর বিচিত্র রূপের গুনগান গেয়েছেন। প্রাচীনকালেও নারী বৈচিত্র্যপূর্ণ জীবন লক্ষ্য করা যায়। বৈদিক যুগে নারী-পুরুষের পাশাপাশি সমমর্যাদা স্থান পেয়েছেন। নারীকে কখনো গৃহকর্মে নিপুন হতে কখনো বা কৃষি কর্মে লিপ্ত থাকত। আমরা নারীর বিচিত্র রূপে থাকি। বাংলা সাহিত্যের বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার মোট চৌদ্দখানি উপন্যাসের মধ্যে যে অসংখ্য নারী চরিত্রগুলি সৃষ্টি করেছেন এর মধ্যে কেউ কেউ উপন্যাসের নায়িকা কেউবা সহনায়িকা বা পার্শ্বনায়িকা, কোন কোন নারী অবস্থান একেবারে সমাজের নিচু স্তরে কেউবা বিধবা জীবনযাপন যন্ত্রণায় ভুগেছে, কেউ বঙ্কিমচন্দ্রের যে সমস্ত সামাজিক উপন্যাস রয়েছে সেখানে নায়িকার সকলই প্রায় ঘরোয়া তারা সকলেই প্রায় সুখি দাম্পত্যে বিশ্বাসী। এবং এরা পতি

সেবায় নিজেদের নিয়োজিত করে রেখেছে। যদি আমরা তার ঐতিহাসিক উপন্যাস গুলোর দিকে লক্ষ্য করি, তাহলে দেখতে পাবো যে তারা কিছুটা স্বপন বিচরণশীল নারী। অন্যদিকে বাস্তব জীবনের লড়াকু নারী তার উপন্যাসে গর্জে উঠে এসেছে। কিন্তু তারা মানসিকভাবে চেনা জীবনের সৌরভ টুকু ছড়িয়ে দিয়েছেন তাদের ব্যক্তিগত জীবনে। বঙ্কিম উপন্যাসের নায়িকারা স্বভাবে স্নিগ্ধ, সৌন্দর্য ও লাবণ্যময়ী স্বভাবে তা কিছুটা মৃদু এবং কিছুটা নিরুচ্চারিত এবং তাদের বেশিরভাগই সংসার কাজে নিরুচ্চারিত। তার উপন্যাসের নায়িকারা বেশিরভাগই সংসার জীবনযাপনে ততটা পটু অর্জন করতে পারেনি তাদের জীবনের একমাত্র প্রেম প্রণয়ের উপাদান ছাড়া অন্য কিছু সমস্যা সৃষ্টি করতে পারেনি। তাই আমরা দেখেছি। তারা বেশিরভাগই প্রণয় ঘটিত সমস্যায় জর্জরিত হয়েছে। নারীদের এই গোপন স্পৃহা ও তাদের যে বিরম্বনার বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। তার উপন্যাসের আরেকটি উপাদান হল তার নায়িকারা অসম্ভব সুন্দরী। তারা আকর্ষণযোগ্য হলেও তারা রহস্যময়ী স্বভাব সুলভ। অথবা কখনো আবার প্রখর দীপ্তমান চরিত্র নিয়ে হাজির হয় কপালকুণ্ডলা, পদ্মাবতী বা শৈবলিনী। বঙ্কিমচন্দ্র নায়িকা চরিত্রের মধ্যে স্নিগ্ধতা দেখিয়েছেন 'দুর্গেশনন্দিনী' উপন্যাসের তিলোত্তমার মত পরবর্তী উপন্যাসগুলোর নায়িকা সকলেই কমবেশি শান্ত স্নিগ্ধ পেলবতার অধিকারিনী। কপালকুণ্ডলার কথা বলতে গিয়ে শ্রীকুমার বন্দোপাধ্যায় বলেছেন "কপালকুণ্ডলা বিশেষত বিজ্ঞ ছিল না। সুতরাং বিজ্ঞের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন না। কৌতুহল পরশরমণীর ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন। ভীমকান্তি রূপরাশি দর্শন লোলুপ যুবতির ন্যায় সিদ্ধান্ত করলেন, নৈশ-বন-ভ্রমণ বিলাসিনী সন্ন্যাসী পালিতার ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন।" "জলন্ত বহ্নিশিখায় পতনোম্মুখ পতঙ্গের ন্যায় সিদ্ধান্ত করিলেন।"[২]

অন্যদিকে নায়িকার পার্শ্বনায়িকারাও উপন্যাসের স্থান-কাল পাত্রভেদে স্নেহময়ী ও দরদী গোছের তারা সাংসারিক দক্ষ যেমন 'রজনী'র লবঙ্গলতা, কমলমনি সুভাষিনী। আরো কখনো বা তারা আবার কখনো তীব্র গোছের যেমন আয়েশা, নিশা, হীরা, মতিবিবি প্রমুখ চরিত্রগুলি। বঙ্কিম তার উপন্যাসের নারীদের ব্যক্তির প্রসঙ্গ আমাদের মনে আসে কিছু সন্ন্যাসিনী নারী চরিত্রের কথা। তাদের স্বামী থাকুক বা নাই থাকুক তাদের জীবন যাত্রার রূপ তিনি দেখিয়েছেন ভিন্নভাবে। এই নায়িকাদের মধ্যে আমরা যাদের পাই তারা হলেন শ্রী, শান্তি, প্রফুল্ল এবং নিশা ও জয়ন্তী স্বামীহীনা।

এই নায়িকাদেরও নানারকম প্রকারভেদ আছে। প্রফুল্লকে আমরা দেখতে পাই সে প্রথম জীবনে সন্ন্যাস গ্রহণ করলেও উপন্যাসের চরমতম পর্বে সে পুনরায় সংসার জীবনে নিষ্কাম ভাবে প্রবেশ করে, আবার অন্যদিকে আমরা দেখি স্বামীর জীবনানন্দের সান্নিধ্যে থেকে শান্তি অর্ধ সন্ন্যাসী জীবনে বেঁচে নেয়। অন্যদিকে শ্রীর সন্যাস গ্রহণে জন্যই তার স্বামী অধঃপতনের মুখে পতিত হলে বঙ্কিম উপন্যাসের অধিকাংশ নায়িকারায় রক্ষণশীল মনোভাবাপন্ন এবং তাদের সহনায়িকারাও প্রায় একই রকমের। স্বামীর প্রতি তাদের নিষ্ঠা অবিচল। কিছু উপন্যাসে স্বামীর প্রতি আস্থা চলে গেল বিভিন্ন সময় তারা পতির প্রতি নিষ্ঠা হারাননি। যেমন ভ্রমর, সূর্যমুখি, মৃণালিনী, মনোরমা, কমলমনী, নন্দা, দলনী বেগম, দরিয়া বিবি এরা ভিন্ন ধর্মের হলেও বিষ বৃক্ষের ফল তাদের কখনোই কাম্য ছিল না। বিষবৃক্ষ বঙ্কিমচন্দ্রের শ্রেষ্ঠ সামাজিক উপন্যাস। বঙ্কিম নারীর স্বামীর প্রতি অনুগত্য কম ছিল না। সূর্যমুখী, কমলমনি, দলনী বেগম, দরিয়া বিবি প্রভৃতি নারীরা এর অন্তর্ভুক্ত। স্বামীর শত দোষ থাকা সত্বেও তারা মেনে নিয়েছে কিন্তু বিষবৃক্ষ উপন্যাসে ভ্রমরের ক্ষেত্রে কিছুটা প্রতিবাদের সুর আমরা শুনতে পাই কিন্তু শেষ পর্যন্ত স্বামীর ব্যভিচারিতা থাকা সত্ত্বেও তাকে আশ্রয়দাতা হিসেবে গ্রহণ করেছে। "আজ আমার সকল অপরাধ মার্জনা করিয়া আশীর্বাদ করিও যেন জন্মান্তরে সুখী হই।"[৩]

অন্যদিকে আমরা দেখতে পাই প্রফুল্ল বহু কৃচ্ছ সাধনায় নিজেকে নিয়োজিত করেছে বেশ কিছুদিন রাণীগিরি করে শেষকালে গৃহস্থালিতে মনোযোগ দিয়েছে। প্রফুল্ল বহু প্রফুল্ল শেষ পর্যন্ত গৃহ জীবনে ফিরে এসেছে। কেননা

তিনি যা মনে করেছিলেন তিনি তাই করেছেন তাই উপন্যাসে আমরা বলতে শুনি "এই ধর্মই ত্রিলোকের ধর্ম। রাজত্ব স্ত্রী জাতির দর্ম নয়।"[৪] নারী স্বামীর প্রতি চিরন্তন সংস্কার প্রফুল্লের মনে দেখা গেলেও সর্বত্র সেটা লক্ষ্য করা যায় না যেমন সূর্যমুখী এর ব্যতিক্রম। হিন্দু নারীরা তার স্বামীর প্রতি যে অবিচল নিষ্ঠা দেখিয়েছেন হিন্দু ঘরের কুলবধূ সূর্যমুখী তা দেখতে পারেননি তা করতে পারেননি। কিন্তু অন্যদিকে আমরা সূর্যমুখীর ননদিনী কমলমনির স্বামী ভক্তির কথা জানতে পারি।

কেন কেননা কমলমনি জানতো যে তার দাদা নগেন্দ্র তার বৌদির প্রতি কোন তার আশক্ত নয়। তা সত্ত্বেও সে বলেছে তার স্বামী ভক্তি সে এতটুকু কামনা হয়-

> "তুমি পাগল হইয়াছ নচেৎ তুমি স্বামীর হৃদয় প্রতি অবিশ্বাসিনী হইবে কেন? স্বামীর প্রতি বিশ্বাস হারাইও না। আর যদি নিতান্তই সে বিশ্বাস না করা ফিতে পারো তবে দীঘির জলে ডুবিয়া মর।"[৫]

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার হিন্দু নারী যে স্বামীর প্রতি পতিভক্তি দেখিয়েছেন তেমনি একই প্রকার স্বামী ভক্তি আমরা দেখতে পাই তার মুসলমান নারী চরিত্র গুলোর মধ্যেও। আমরা বলতে পারি জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তিনি স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আনুগত্যতাই যেন দেখিয়েছেন। রাজসিংহ উপন্যাসে দরিয়া বিবির সম্পর্কে কথা বলা যায়। দরিয়া প্রসঙ্গে এককথা বলা যায়। দরিয়া বিবি ভাগ্য দোষে স্বামীর মনযোগ হারিয়েছে। তার স্বামী বাদশাহজাদির প্রেমে পরে তাকে ভুলে যায় এবং বাদশাহজাদিকেই বিয়ে করে। কিন্তু দরিয়া বিবি তার স্বামীকে কিছুতেই ভুলতে পারেনি। সে স্বামীর প্রেমে প্রত্যাঘাত হয়ে উন্মাদিনী হয়ে ওঠে। এর পরিণাম স্বরূপ আমরা দেখতে পাই যে সে তার স্বামীকে হত্যা করেছে। সে স্বামী ছাড়া অন্যদিকে মন সরাতে পারেনি। স্বামীকে না পেয়ে সে অন্যকেও সে ভাগ দিতে পারেনি। তার মধ্যে আমরা প্রেমের একনিষ্ঠতার পরিচয় পাই। অন্য একজন মুসলমান নারীর কথা বলতে পারি সে হল দলনি বেগম। নবাব মীরকাসেম এর সহধর্মিনী। তিনি ভুল বুঝে স্বামী মৃত্যুদণ্ড দিলে সে কোন প্রতিবাদ করেনি। শেষ পর্যন্ত সে তা নিরবে মেনে নিয়েছে। ইন্দিরা উপন্যাসে ইন্দিরা স্বামীকে সেভাবে বশীভূত করার চেষ্টা করেছেন শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে "স্ত্রী জাতির মোহ বাড়াইবার অমক অস্ত্রগুলি সূক্ষ্মদর্শিতার সহিত প্রদর্শিত হইয়াছে।"[৬]

বঙ্কিমচন্দ্র তার নারী চরিত্রগুলি সন্তর্পনে এঁকেছেন। বিভিন্ন উপন্যাসে বহুবিবাহের ছবি দেখতে পাওয়া যায়। তৎকালীন সময়ে বহুবিবাহ প্রথা প্রচলিত ছিল অনেক উপন্যাসে আমরা এই বহুবিবাহ প্রথার প্রচলন দেখতে পাই। যেমন দেবী চৌধুরানী, সীতারাম, কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের নায়কের একাধিক পত্নী রয়েছে। কুলীন কন্যারা শপত্নী নিয়েই সংসার করেছে। যেমন প্রফুল্লের সপত্নীর নাম সাগর, নন্দার সতিনের নাম রমা। সতিনরা একে অপরের প্রতি শ্রদ্ধাশীল বোঝাপড়া নিয়ে জীবন অতিবাহিত হতে দেখা যায়। সমাজে অন্যদিকে আমরা দেখি বঙ্কিম তার লেখায় সহমরণের মতো কুপ্রথাটির কথা এসেছে। তার উপন্যাসে সহমরণের কথা

> "শুরুতে রয়েছে মৃণালিনী উপন্যাসটি এই উপন্যাসের নায়িকা মনোরমা। মনোরমার স্বামী মৃত্যুর পর সে অদৃষ্টের চক্রে বিবাহিত হয়েও নিজ সংসার করতে পারেনি। গ্রন্থের মধ্যে সর্বাপেক্ষা আকর্ষণীয় চরিত্র মনোরমা। মনোরমার চরিত্রে দ্বৈধতা আশ্চর্য দৃষ্টিতে বঙ্কিমচন্দ্র এঁকেছেন।"[৭]

কিন্তু তা সত্ত্বেও মনোরমা তার স্বামী পশুপতির মৃত্যুর পর সামাজিক রীতিনীতিকে মান্যতা দিয়ে স্বামীর জ্বলন্ত চিতায় নিজেকে সঁপে দেন। আমরা আবার অন্যত্র দেখেছি বঙ্কিম শুধু নারীদের সমানভাবে পতিভক্তির পরিচয় রেখে যাননি, তিনি কোথাও নারীদের সমাজের বিধি নিষেধের বাইরে নিয়ে গেছেন। যেমন তার তীক্ষ্ণ প্রেমের

ভাবাবেগে বিবাহিত নারীরা ঘর ছেড়েছে যেমন চন্দ্রশেখর উপন্যাসে শৈবলিনী সীতারাম উপন্যাসে রমার কথা আমরা বলতে পারি। তারা নিজেদের প্রেমাস্পদের কাছে ধরা দিতে চেয়েছে।

বঙ্কিমচন্দ্রের রচনাতে নারী জীবনের কথা বিভিন্নভাবে লেখা হলেও বাল্যবিবাহের প্রসঙ্গটি একটি বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে এমন যেখানে তৎকালীন সময়ের চিত্র ধরা পড়েছে। সেই বাল্যবিধবাদের সে কাম প্রভৃতি তা কখনোই তিনি তা অস্বীকার করেননি। বরং দেহজ কামনা বাসনাকে প্রাকৃতিক স্বাভাবিক প্রবৃত্তি হিসেবে তিনি সাদরে গ্রহণ করেছেন। এই বাল্য বিধবাদের মধ্যে আমরা পাই বিষবৃক্ষ উপন্যাসের কুন্দনন্দিনী ও হীরাকে এবং কৃষ্ণকান্তের উইল ও দুর্গেশনন্দিনীর যথাক্রমে রোহিনী ও বিমলাকে। এই বাল্যবিধবাদের মধ্যেও রয়েছে ভিন্ন অবস্থা, বিষবৃক্ষের কুন্দ নন্দিনী বাল্যকাল এসে তার স্বামীর সংসার করেছেন তিন বছর কিন্তু স্বামীর মৃত্যুর পর তার কোন অনুশোচনা নেই বরং সে পরবর্তীকালে ধনবান বিবাহিত পুরুষের প্রেমে পড়ে। বিষবৃক্ষ উপন্যাসের ক্ষেত্রেও আমরা তাই দেখতে পাই যে হীরা সামান্য পরিচারিকা ছিল। সেও হিন্দু নন্দিনীর মতো বাল্যবিধবা হওয়া সত্ত্বেও তার মধ্যে সংযমের অভাব ছিল না। একটা সময় সৌম্য কান্তি যুক্ত চেহারা ও সঙ্গীত ধারায় লিপ্ত এক পুরুষের প্রেমে সে পড়ে। সেই পুরুষের প্রেমে হীরা অবগাহন করেছে অবলীলা ক্রমে। কৃষ্ণকান্তের উইল উপন্যাসে রোহিনী ছিল যৌবনাবতী অপরূপা বিধবা রমণি। তার নানারকম গুনাবলী ও তার মনে সংসার করার অতৃপ্ত বাসনা ছিল। কিন্তু রোহিনীর মনে প্রেম সম্পর্কে গভীর অনিশ্চয়তা ছিল। অন্যদিকে যদি আমরা তাকাই তাহলে দেখতে পাবো বঙ্কিমচন্দ্র তার মাধুর্য বজায় রেখেছেন যা সহৃদয় পাঠকের মনে এক স্নিগ্ধ অনুভূতি প্রদান করেছে।

বঙ্কিমচন্দ্র নারী বিভিন্ন রূপ-বৈচিত্রের মধ্যে স্বৈরিনী চরিত্রের ছবি এঁকেছেন। এই স্বৈরিনী চরিত্রগুলো তার উপন্যাসের সর্বত্র দেখা না গেলেও রাজসিংহ, কপালকুণ্ডলা এবং ইন্দিরা উপন্যাসের মধ্যে কিছুটা দেখা গেছে। বঙ্কিমচন্দ্র তার রাজ সিংহ উপন্যাসে ঔরঙ্গজেবের কন্যা জেব উন্নিসার চরিত্রে প্রেমের টানাপোড়েনের মোড় সুন্দর ভাবে তুলে ধরেছেন। অন্যদিকে তিনি কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের মতিবিবি চরিত্রেও কিছুটা স্বৈরিনী প্রভাব রূপে দেখতে পাওয়া যায়।

সেখানে আমরা দেখতে পাই তার ইন্দিরা চরিত্রটিকে একেবারেই উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সেখানে আমরা দেখতে পাই তার ইন্দিরা ও তার স্বামী সম্পর্কের ঘনিষ্ঠতার অভাবে ফাঁসে এসে তার স্বামীকে নানারূপ ছলাকলায় বিভ্রান্ত করতে চেয়েছে। বঙ্কিমচন্দ্র কয়েকটি নারী চরিত্রকে স্মরণীয় করে রাখতে চেয়েছে। তার বিশেষ কয়েকটি উপন্যাসের মধ্যে যাদের মধ্যে অন্যতম হলেন দুর্গেশনন্দিনী উল্লেখযোগ্য। দুর্গেশনন্দিনীর সৃষ্টি পর্বে তিনি খুলনা ও বারুই পুরে কর্মরত ছিলেন। আর সেই সময় বিভিন্ন লেখালেখিতে পরিপূর্ণ হয়েছিল। যেমন একাধিক পত্র-পত্রিকাকে তিনি লিখেছেন। বঙ্কিমচন্দ্রের সৃষ্টির প্রথম মানষ প্রতিমা তিলোত্তমা, জয়সিংহের পরম আকাঙ্খার ধন এই নারী। কিন্তু বাংলা উপন্যাসের প্রথম ব্যক্তিত্বময়ী নারী হলেন নবাব কন্যা আয়েষা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় প্রচন্ড রক্ষণশীল হলেও তার সাহিত্যে তিনি নারীদের সামাজিক স্বতন্ত্রবোধ ও মর্যাদাপূণ্যের কথা বলেছেন। নারী মনের মাধুর্যপূর্ণ বিচরণের কথা বলেছেন তার নায়িকারা কোন দাসী রূপী নয়। তারা দোষে গুনে স্বয়ং সম্পূর্ণা। তারা নির্ভয়ে কখনো কখনো প্রাণপ্রিয় পুরুষের কথা মুখে আনতেও দ্বিধা করে না। নিজের প্রেমিকের কথা মুখে আনা বাংলা সাহিত্যে এই প্রথম দেখা যায়। সেখানে ধর্মের ও সমাজের কোন পরোয়া না করে মধ্যযুগীয় সংস্কার থেকে মূল্যবোধের বাইরে বেরিয়ে এসেছে। এই উপন্যাসের আরেকজন সাহসী নির্ভীক নারী বিমলা সে নিজেকে আড়ালে রেখে প্রেমাস্পদকে আজীবন ভালোবেসে গেছে। এবং কতলু খাঁকে কৌশলে হত্যা করে। আরেকটি চরিত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র ফুটে তুলেছে চেয়েছেন তিনি হলেন রজনী উপন্যাসের লবঙ্গলতা। রজনী উপন্যাসে কেন্দ্রীয় চরিত্র না হওয়া সত্ত্বেও তার দ্বন্দ্ব বাস্তব সম্মত। সে প্রেমাস্পদ অমরনাথকে চিরকাল ভালোবেসেছে।

অথচ সংসার করেছে এক বৃদ্ধ স্বামীর সঙ্গে। সেখানে সে সতীন সপত্নীপুত্র সকলের সঙ্গে মানিয়ে গুছিয়ে সংসার করে। অমরনাথকে ভালোবাসলেও সে সমাজের বিরুদ্ধে গিয়ে তা পূর্ণতা দিতে রাজি হয়নি। সে পরজনমে অমরনাথকে পাবার আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বর্তমানে বলতে পারে

> "যে আমার স্বামী না হইয়া, এইবার আমার প্রণয়াকাঙ্খী হইয়াছিল, তিনি স্বয়ং মহাদেব হইলেও তাহার জন্য আমার হৃদয়ের এতটুকু স্থান নাই।"[৮]

রজনী উপন্যাসে লবঙ্গলতা নারী চরিত্রটি একটি জটিল ঘুর্ণাবর্তে ঘেরা। কিন্তু রজনী উপন্যাসের রজনী তাকে সবলা নারীরূপে বঙ্কিমচন্দ্র তাকে অঙ্কন করেছেন। সে জন্মান্ধ হওয়ার জন্য রূপ রসের অনুভূতির জগৎ গড়ে উঠেছে তার ভুবন। একদিকে শচীন্দ্রর জন্য তার মনে গড়ে উঠেছে নিষ্কলুষ ও নিরুচ্চারিত প্রেম। অন্যদিকে বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় একেবারে ভিন্ন ধর্মী দুজন নারীর রূপ চিত্র অঙ্কন করেছেন। একজন কপালকুণ্ডলা উপন্যাসে নবকুমারের প্রথমা পত্নী পদ্মাবতী। পদ্মাবতীর জীবনে নানা ঘটনার আবর্তে পড়ে ধর্মান্তরিত হয়ে তিনি লুৎফ-উন্নিসা নামে পরিচিতি লাভ করে। হিন্দু কন্যার যবনে পরিণত হওয়ার কাহিনি। তিনি মোগল হারামে দিন কাটিয়েও তিনি ভুলতে পারেননি তার দাম্পত্য জীবনের কথা ও কিশোরী বয়সে প্রেমের কথা বিস্মৃত হননি। মোগল হারামে থেকে সে শক্তিমান পুরুষকে তার শয্যাসঙ্গিনী করতে চেয়ে ব্যর্থ মনোরথ হয়। তখনই সে তার বিবাহিত স্বামী নবকুমারকে মনে করেছে। মোগল হারামে দিন কাটার পর যখন একদিন স্বামীর সঙ্গে তার দেখা হয় সে কোনভাবেই সে আর আমার স্বামী বলতে পারে না কেননা সে যে বিধর্মী হয়েছে। কিন্তু নারী হৃদয়ের মনস্তত্ত্ব বঙ্কিমচন্দ্র খুব সুচারুরূপে অঙ্কন করেছেন কেননা আমরা দেখি নববিবাহিত নবকুমারকে দেখে তার হৃদয় তোলপাড় করে ওঠে। স্বামীর প্রতি প্রেম লিস্পা তাকে দংশন করেছে। অনবরত। তাইতো সেই মতিবিবি নামে নবকুমারের জীবনে হাজির হয়েছে। নির্জন দূর অরণ্যে সাগর কুলে বেড়ে ওঠা কপালকুণ্ডলা প্রতি বঙ্কিমচন্দ্র সুবিচার করেননি। প্রকৃতির নিবিড় সান্নিধ্য পেয়ে মানব মনের প্রেম জীবন সম্পর্কে সে বিমুখ হয়ে পড়েছে। বিপদের সময়ও পরিত্রাতা স্বামীর প্রতি সে উদাসীন থেকেছে। তাকে বঙ্কিমচন্দ্র এমন ভাবে অঙ্কন করেছেন যে সে মানবী হয়েও মানবী নয়, মানুষের সঙ্গ তার প্রিয় নয়। সে মনে অনেক দূরের অনেক বেশি আগম্য। অরণ্য প্রকৃতি জীবের মতো এসেও অবাধে বেড়াতে অভ্যস্ত। নারীর অলংকারের প্রতি যে লোভ থাকে তার নেই। সে অনায়াসে ভিক্ষুককে অলঙ্কারগুলো দিয়ে দিতে পারে।

বঙ্কিমচন্দ্র নবকুমার ও কপালকুণ্ডলার দাম্পত্য জীবনে চিত্র দেখাতে পারেননি। সে সময়কার সামাজিক পটভূমিতে এটি করে দেখানো হয়তো সম্ভব হয়নি। কপালকুণ্ডলার যৌন সম্পর্কে দেহ বিমুখ এক নারী চরিত্র বড় মমতায় বঙ্কিমচন্দ্র তুলে ধরেছেন। তবে নারীর দেহকে তিনি এড়িয়ে চলে গিয়েছিলেন। তবে এত প্রাকৃতিক প্রকৃতির ঘোরতর নিয়মলঙ্ঘন। কপালকুণ্ডলার চরিত্রের মাধ্যমে কি যৌবনের সময় কালকে অস্বীকার করেছেন। কিংবা তাকে অনুভূতিহীন নারীতে পরিণত করেছেন। কপালকুণ্ডলা উপন্যাসের আরেকটি চরিত্র হলো কপালকুণ্ডলার ননদিনী শ্যামা সুন্দরী। সে কপালকুণ্ডলার ঠিক বিপরীত মানসিকতার পরিচয় দিয়েছে। স্বামীর সঙ্গের মূল্য জানে শ্যামা সুন্দরী। তাই স্বামীর দ্বারা বঞ্চিত হয়ে সে স্বামীর মূল্য অনুধাবন করতে পেরেছে। তাই আমরা দেখি কপালকুণ্ডলার যৌবনকে সে নানাভাবে জাগিয়ে তুলতে চায়। শ্যামা সুন্দরী কপালকুণ্ডলাকে শোনায়

বাঁধবো চুলের রাস করাবো চিকন বাস,
খোঁপায় দোলার মতো ফুল।
কপালে সিথির হার কাকালিতে চন্দ্রহার

....

সোনার পুত্তুলি ছেলে কোলে তোর দিব ফেলে
দেখি ভালো লাগে কি না লাগে।[৯]

শ্যামা সুন্দরী মনে করে পুরুষ মানে এক পরশপাথর। তাকে পাওয়ার জন্য সে যে কোন দুঃসাহসিক কাজ করতে পারবে। স্বামীর সঙ্গ লাভ করার জন্য সে গভীর রাতে ঔষধি গাছ তুলে এনে স্বামীকে বশীভূত করতে চায়। এই মনের গোপন চাহিদা কি ভীষণ রকম অকল্পনীয়। এ যেন বাংলার প্রতিটি নারী হৃদয়ে গোপন ইচ্ছা। বঙ্কিমচন্দ্রের চন্দ্রশেখর উপন্যাসের আরেকজন নায়িকা শৈবলিনী। চন্দ্রশেখরের জীবনসঙ্গিনী হয়েও বাল্যপ্রেমিক প্রতাপকে কখনো সে বলতে পারে না। সে প্রেমকেই সে আঁকড়ে ধরেছে সারাজীবন।

সে বেদগ্রামের কুটির থেকে প্রতাপের আবাসে গেছে স্বাচ্ছন্দে। শৈবলিনী শুধুমাত্র তার প্রেমিক প্রতাপকে দেখার জন্য তিনি ইংরেজ যুবক ফস্টারের সঙ্গলাভ করেছে। সারা ছন্দে স্বচ্ছন্দভাবে সে বিভিন্ন জায়গায় ভ্রমণ করেছে। এ যেন আত্মশক্তিতে বলিয়ান নারীর এক অভাবনীয় যাত্রা। সে পরকিয়া প্রেমে যেমন অকপটতা দেখিয়েছে তেমনি তার স্বামী চন্দ্রশেখরকেও প্রশ্নবানে বিদ্ধ করতে ভলে না। উপন্যাসের আরেকটি চরিত্র দলনী বেগম। এখানে নারীর সাধ্বী রূপটি একটি অঙ্কন করেছেন। একেবারে একটি সতীর্থ ধর্ম রক্ষা করার জন্য দলনী বেগমের সহিষ্ণুতা একটি দৃষ্টান্তমূলক উদাহরণ। দলনী বেগম পতিগত প্রাণ ছিল। তাই স্বামীর আদেশ মাথা পেতে নিয়ে সে বিষপান করেছে। কেননা স্বামী তাকে অবিশ্বাস করেনি। শেক্সপিয়ারের দেসদিমোনার ছায়া তার উপর পড়েছে। বিষবৃক্ষ বঙ্কিমচন্দ্রের একটি সামাজিক উপন্যাস। এই উপন্যাসে নারীদের সৌন্দর্য বর্ণনা করেছেন ও তাদের জীবনযাত্রা তুলে ধরেছেন। সূর্যমুখী কুন্দনন্দিনী পার্শ্বনায়িকা কমলমনি এবং খলনায়িকা হীরা। বঙ্কিমের সাহিত্যে ঘরের মেয়ে হয়ে দেখা দিয়েছিল। সূর্যমুখী তার রূপ গুণের কোন তুলনা হয়না সে ব্যক্তিত্বশালিনী সংসারের সর্বময়ী কর্ত্রী। স্বামীর প্রেয়সী সে কিছু ইংরেজি শিক্ষাও করেছে মিস টেম্পল এর কাছে। অন্যদিকে কুন্দনন্দিনী বালবিধবা অপরূপা সুন্দরী। সে নিত্য স্ত্রী বিন্দুর মতন। বহু বিবাহ নিয়ে নানা রকম বিদ্রোহ সামাজিক দিক থেকে উঠলেও তা সমাজ থেকে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়নি। বঙ্কিমচন্দ্র ফিরিয়ে আনলেন নগেন্দ্রকে তার প্রতি পরায়ন স্ত্রীর কাছে। এবং বিধবা কুন্দনন্দিনী আত্মহত্যা করে। সূর্যমুখীকে তার জায়গায় আশ্বস্ত করে গেল। সূর্যমুখীর মধ্যে এক দীপ্ত তেজ দেখিয়েছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র সে স্বামীর বহুগামীতাকে মেনে নিতে পারেনি। তাই সেকালের পটভূমিতেও আমরা দেখি অন্তপুর চারিণী সূর্যমুখী গৃহত্যাগের মতো সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। এই গৃহত্যাগের সংকল্প থেকে বোঝা যায় তার আত্মমর্যাদা কতটা গভীর ছিল। প্রিয় পুরুষের সুখের জন্য তাকে অভিপ্রেত মানুষের হাতে তুলে দিয়েছে। সূর্যমুখীর ননদিনী কমলমনি একটি প্রাণবন্ত দীপ্তিময় চরিত্র। তার স্বামীর নাম শ্রীশ সংসারের সর্বময় কর্ত্রী। ছিলেন সেই স্বামীর প্রেয়সী। স্বামী স্ত্রীর মধ্যে এক বন্ধুত্বের সম্পর্ক। স্বামীর বুদ্ধিমত্তার উপর তার বিশ্বাসও অগাধ ছিল।

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ছিলেন সাহিত্য জগতের এক শ্রেষ্ঠ রূপকার। তিনি তার সৃজন ও মননে তার সাহিত্যের সম্ভারকে পরিপুষ্ট দান করেছিলেন। তিনি নিজে রক্ষণশীল হয়েও নারীর মানসিক শান্তির পথকে উন্মুক্ত করতে চেয়েছেন তার লেখনীর মাধ্যমে। তার উপন্যাস বাংলা সাহিত্যের প্রথম উপন্যাস হিসেবে ধরা হয়। যদি তার পূর্বে কিছু কিছু সাহিত্যে উপন্যাসের লক্ষণ ধরা দিয়েছিল। তিনি ছিলেন প্রথম সার্থক উপন্যাসিক তিনি মোট চোদ্দটি উপন্যাস রচনা করেছিলেন। প্রতিটি উপন্যাসে নারীর বিচিত্র রূপরেখা অঙ্কন করেছেন। তেমনি তাদের জীবনের টানাপোড়েন তিনি তুলে ধরেছেন একজন মনস্তাত্ত্বিকের মত। কখনো নারীর প্রেমের দ্বন্দ্ব, কখনো নারীর বৈধব্যদশার যন্ত্রণা, কখনো নারীর পরকিয়া প্রেমের প্রতি আত্ম বলিদান আবার কখনো গোপন প্রেমের অর্ন্তজ্বালা সম্পর্কের টানাপোড়েন সকলই তার ক্ষুরধার লেখনীতে ফুটে উঠেছে। তার রচনার প্রতি নারীই মহিয়সী, অসাধারণ রূপসী, স্বেচ্ছাচারিনী সমগ্র উপন্যাসের চালিকাশক্তি। এই নারীরা তার

সমসাময়িক সময়ে তুলনায় অনেকাংশই অগ্রগামী। আমরা দেখি ছক ভাঙ্গা প্রতিটি চরিত্রের শেষ পরিণতি হল সংসারের চেনা বৃত্তে ফেরা। শত অপমানের পর এই নারীরা তাদের প্রিয়জনকে ক্ষমা করে দেয়। এই কারণেই হয়তো আমরা দেখতে পাই ডাকাত রানী হয়েও প্রফুল্ল শেষে পুকুর পাড়ে থালা-বাসন ধোয়। নারীর চিরকালীন আপসের চরিত্রটি এখানে ফুটে উঠেছে। বঙ্কিমের মানস পটেই ভেসে উঠতো মহীয়সী গৌরবময় মাতৃমূর্তি। সেই কারণেই হয়তো দেশ মাতৃকার সন্ধান তার কণ্ঠে ধ্বনিত হয়। তার উপন্যাসে বিচিত্রময়ী নারী ও তাদের নানা জীবন চিত্র সুচারুরূপে ফুটে উঠেছে।

তথ্যসূত্র:

১। ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ। 'মহুয়া কাব্যগ্রন্থ'। বিশ্বভারতী, গ্রন্থালয়, আশ্বিন ১৩৩৬, পৃ. ৬৩।
২। বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'। প্রথম সংস্করণ ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, মডার্ণ বুকে এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড, পৃ. ১১০।
৩। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। 'কৃষ্ণকান্তের উইল', বঙ্কিম রচনাবলী, দ্বিতীয় খন্ড। সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৬০২।
৪। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। বঙ্কিম রচনাবলী, প্রথম খন্ড, দেবীচৌধুরানী। সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৮৭০।
৫। চট্টোপাধ্যায় বঙ্কিমচন্দ্র, 'বঙ্কিম রচনাবলী', প্রথম খন্ড, বিষবৃক্ষ, সাহিত্য সংসদ, পৃ. ২৯৯।
৬। বন্দোপাধ্যায়, শ্রীকুমার। 'বঙ্গসাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'। প্রথম সংস্করণ ১৩৩০ বঙ্গাব্দ, মডার্ণ বুকে এজেন্সি প্রাইভেট লিমিটেড পৃ. ১১০।
৭। দত্ত, বিজিত কুমার। 'বাংলা সাহিত্যে উপন্যাসের ধারা'। চতুর্থ সংস্করণ ১৪০২ ঘোষ ও মিত্র পাব্লিকেশান, পৃ. ৭৮।
৮। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। 'বঙ্কিম রচনাবলী', প্রথম খন্ড। হেয়ারপ্রেস, পৃ. ৫৩৬।
৯। চট্টোপাধ্যায়, বঙ্কিমচন্দ্র। 'বঙ্কিম রচনাবলী', দ্বিতীয় খন্ড। সাহিত্য সংসদ, পৃ. ১৬০।